ডলারের নিচে চাপা পড়েছে ৮ সহস্র প্রবাসী শ্রমিকের লাশ

ভ্যানগার্ড প্রতিবেদন

দেশে রেমিটেন্স (প্রবাসী বাংলাদেশীদের পাঠানো অর্থ) প্রবাহ নাকি মে মাসে সর্বকালের রেকর্ড অতিক্রম করেছে। এককভাবে কোনো মাসে ইতিহাসের সর্বোচ্চ ৮৯ কোটি ৫ লাখ ডলার রেমিটেন্স এসেছে মে মাসে। ধারণা করা হচ্ছে, এ প্রবাহ অব্যাহত থাকলে চলতি অর্থবছরে রেমিটেন্সের পরিমাণ ৯০০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যাবে। জীবনযাত্রা সচল রাখতে ডলারের এ প্রবাহ বাংলাদেশের জন্য বিরাট এক ভরসাস্থল। তাই শাসকদের জন্য এ ঘটনা খুবই স্বস্তিদায়ক। কিন্তু এ ডলারের বেদিমূলে প্রতিনিয়ত নিঃশব্দে কত প্রবাসী শ্রমিকের জীবন বলি হচ্ছে তার কি কোনো খোঁজ আছে? অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, এ সংখ্যাটা দুই-দশ নয়, এমনকি শতকের ঘরেও নয়, সহস্রের কোটা ছাড়িয়েছে। অর্থাৎ, রেমিটেন্সের পরিমাণের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে প্রবাসী শ্রমিকের লাশের সংখ্যা।

প্রবাসী শ্রমিকদের পাঠানো রেমিটেন্স নিয়ে যত উচ্ছ্বাস, বিদেশে যেনতেনভাবে শ্রমিক পাঠানোর ব্যাপারে যত তৎপরতা লক্ষ করা যায় – প্রবাসে তাদের কাজ ও জীবনের নিশ্চয়তা এবং নিরাপত্তা নিয়ে কি সরকার কি অন্য কারো সে অনুপাতে কোনো উদ্বেগ বা তৎপরতা আছে বলে মনে হয় না। যদি তাই হতো তাহলে গত কয়েক বছর ধরে এভাবে প্রবাসী শ্রমিকের মৃত্যুর হার লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ত না।

গত ৫ বছরে বিদেশ-বিভূঁইয়ে নিহত প্রবাসী শ্রমিকের সংখ্যা ৮ হাজারেরও বেশি। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে মে মাসের ৯ তারিখ পর্যন্ত ৪ মাস ৯ দিনে ৯০৪ জন প্রবাসী শ্রমিকের লাশ দেশে পৌঁছেছে। শুধু মে মাসের প্রথম ৮ দিনেই এসেছে ৬৪ জনের লাশ, যার মধ্যে ৩২ জন নারী শ্রমিক। অর্থাৎ গড়ে প্রতিদিন ৮ জন করে শ্রমিকের লাশ এসেছে। এই ৯০৪ জন শ্রমিকের মধ্যে ৩৯১ জন মৃত্যুবরণ করেছে হৃদরোগে (কার্ডিয়াক এ্যারেস্ট), কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ২৬৮ জনের, ৬২ জন সড়ক দুর্ঘটনায়, বিভিন্ন ধরনের অসুস্থতায় মারা গেছে ১১৫ জন।

এখানে আরো উল্লেখ করা দরকার যে শ্রমিক-মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে। হৃদরোগে মৃত্যুবরণকারী ৩৯১ জনের ১১৯ জন মারা গেছে সৌদি আরবে, মালয়েশিয়ায় ৮২ জন, ৭২ জন সংযুক্ত আরব আমিরাতে, ৩৫ জন কুয়েতে, ওমানে ১৬ জন, কাতারে ১০ জন, বাহরাইনে ১০ জন, সিঙ্গাপুরে ৭ জন এবং লেবাননে ২ জন। (ডেইলি স্টার, ১৩ মে ২০০৯) দৈনিক সমকালে ৮ মে '০৯ তারিখে প্রকাশিত হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে, তখন পর্যন্ত দেশে এসেছে ৮৮১ জন প্রবাসী শ্রমিকের লাশ। এদের ২৫৪ জন মারা গেছে সৌদি আরবে, মালয়েশিয়ায় ১৫৭ জন, দুবাই-তে ১০০ জন, কুয়েতে ৫৫ জন, ওমানে ৩৪ জন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২৭ জন, আবুধাবি-তে ২৪ জন, কাতারে ২১ জন, বাহরাইনে ১৭ জন, যুক্তরাজ্যে ১৬ জন, ইতালি-তে ১৫ জন, দ: আফ্রিকায় ১১ জন, লেবাননে ৬ জন, পাকিস্তানে ৬ জন, গ্রিসে ৫ জন এবং অন্যান্য দেশে ৫২ জন।

তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, ২০০৪ সালের পর থেকে প্রবাসী শ্রমিকদের মৃত্যুর হার লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। বিশেষত, ২০০৭ সালের তুলনায় ২০০৮ সালে সংখ্যাটা দ্বিগুণ হয়েছে। ২০০৭ সালে যেখানে এ সংখ্যাটা ছিল ১ হাজার ৬শ' ৭৩ জন, ২০০৮ সালে এসে সেটা দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ২শ ৩৭ জনে! ডেইলি স্টারের তথ্য মতে, ২০০৪ সালে মৃত্যুবরণকারী প্রবাসী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৭৮৮ জন, ২০০৫ সালে ১ হাজার ২শ' ৪৮ জন এবং ২০০৬ সালে ১ হাজার ৪শ' ২ জন।

মালয়েশিয়ার কারাগারে ও পুলিশী হেফাজতে গত ৬ বছরে মারা গেছে ১ হাজার ৩শ' প্রবাসী শ্রমিক যার একটা বড় অংশ বাংলাদেশি। বৈধ কাগজপত্র না থাকায় পুলিশ এদের গ্রেফতার করে জেলখানা বা থানা হাজতে আটকে রাখে। মালয়েশিয়ার মানবাধিকার সংস্থা সুহাকাম (Suhakam)-এর মতে, এদের মৃত্যুর মূল কারণ সময়মতো চিকিৎসা না পাওয়া। এ সংস্থা আটককৃত অবৈধ শ্রমিকদের চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত করার জোর দাবি জানিয়ে বলেছে, কারাবন্দিদের চিকিৎসা সুবিধা না দেওয়াটা একটা অমানবিক কাজ, মানবাধিকারের লঙ্ঘন। পাশাপাশি পুলিশী নির্যাতনে বাংলাদেশি শ্রমিকের মৃত্যুসহ সকল মৃত্যুর স্বচ্ছ তদন্ত দাবি করেছে এ সংস্থা।

একেবারে খোলা চোখেই বোঝা যাচ্ছে, প্রবাসী শ্রমিকদের অবস্থা ভয়াবহ। একটা অত্যন্ত দুর্বিষহ অসহায় জীবন তারা যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন। আসলে তাদের দুর্ভোগ শুরু হয় দেশের মাটি থেকেই। সরকার নির্ধারিত ফি'র তুলনায় আট/দশগুণ পর্যন্ত টাকা তাদের খরচ করতে হয়। এ খরচ যোগাড় করার জন্য অনেককেই ভিটেবাড়ি-জমি পর্যন্ত বিক্রি করতে হয়। কিন্তু এই ম্যানপাওয়ার বিজনেস বা আদম ব্যবসা বলে পরিচিতি সেক্টরটিতে প্রতারক এবং

দালালদের এতটাই প্রাদুর্ভাব যে প্রতিবছর শত শত বিদেশ গমনেচ্ছু সাধারণ মানুষ প্রতারিত হয়, তাদের টাকা নিয়ে প্রতারকচক্র লাপাত্তা হয়ে যায়। যারা কোনো ক্রমে বিদেশে যেতে পারেন, তখন শুরু হয় তাদের দ্বিতীয় দফা দুর্ভোগ। যে কাজের কথা বলে নেওয়া হয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা সে কাজে নিয়োগ পান না। যে পরিমাণ বেতনের কথা বলা হয়, সে বেতনও তারা পান না। সবচেয়ে অমানবিক, পরিশ্রমসাপেক্ষ, কষ্টকর কাজগুলো জোটে তাদের কপালে। সে তুলনায় বেতন নামমাত্র। কেউ কেউ মাসের পর মাস বেতনের মুখও দেখেন না। কারো কারো কপালে দুর্ভোগের পরিমাণ আরো বেশি থাকে। দেখা যায় তাদের কাগজপত্র জাল। ভুয়া কাগজপত্র নিয়ে তারা পালিয়ে বেড়ান, অনেকেই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে দিনের পর দিন বন্দি হিসাবে বিদেশের কারাগারগুলোতে কাটিয়ে দেন। এই হল বাংলাদেশ থেকে শ্রম বিক্রি করতে যাওয়া লক্ষ লক্ষ গরিব মানুষের জীবনের বাস্তব চিত্র। এবার তার সাথে যুক্ত হয়েছে মৃত্যুর ঘটনা।

মৃত্যুর কারণগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে হৃদরোগ (কার্ডিয়াক এ্যারেস্ট) এবং অন্যান্য অসুস্থতা। প্রশ্ন উঠেছে, যে শ্রমিকরা বিদেশে যান তাদের বয়সসীমা ১৮ থেকে ৪০। অর্থাৎ তারা সকলেই তরুণ। দেশ থেকে যাবার সময় প্রতিটি শ্রমিকেরই স্বাস্থ্য পরীক্ষা (মেডিক্যাল সার্টিফিকেট) করা হয় এবং তাদের সুস্থ বলে ছাড়পত্র দেওয়া হয়। তাহলে ঠিক কি কারণে তারা বিদেশে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন? এখানে বলে রাখা ভাল যে বিদেশে যাওয়ার সময় শ্রমিকদের যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় তা প্রায়শই নামমাত্র, কাগজে-কলমে। টাকার বিনিময়ে গুরুতর অসুস্থ মানুষও সুস্থতার ছাড়পত্র পেয়ে যান। কিন্তু বিদেশে গিয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার এটাই মূল কারণ নয়। ডাক্তারদের মতে এর মূল কারণ হল কাজের অনিশ্চয়তা, বেতনের অনিশ্চয়তা, ঝুঁকিপূর্ণ কর্মপরিবেশ। আগেই বলা হয়েছে, যে কাজের কথা বলে তাদের নিয়ে যাওয়া হয় অনেকেই সে কাজ পান না। একই ব্যাপার ঘটে বেতনের ক্ষেত্রেও। নিজেদের সব সহায়-সম্বল বিক্রি-বন্ধক দিয়ে যখন বিদেশে পাড়ি জমান সেখানে কাজ না পাওয়া, বেতন না পাওয়ায় তাদের উদ্বেগ উৎকণ্ঠার সীমা-পরিসীমা থাকে না। বৈধ কাগজপত্রের অভাবে যাদের পুলিশ বা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে শূন্য হাতে দেশে ফিরতে হয় তাদের সামনে কোনো ভবিষ্যৎ থাকে না। সহায়-সম্বল তো সবই গেছে। যারা কাজ পান তাদের সে কাজ আজ আছে তো কাল নেই। যারা হাড়ভাঙা পরিশ্রমে রক্ত পানি করে সামান্য দু'চার পয়সা দেশে পাঠান তাদের শুরু হয় নতুন দুঃশ্চিন্তা। টাকাটা ঠিকভাবে দেশে পৌঁছবে তো? আত্মীয়-স্বজনরা পাবে তো? এর সাথে আরো একটি বিষয় তাদের দুঃশ্চিন্তা বাড়িয়ে দেয়। প্রবাসীদের পাঠানো টাকা অনেকক্ষেত্রেই আত্মীয়-স্বজনরা নানা ভোগ-বিলাসের আয়োজনে এবং গাফিলতি করে উড়িয়ে দেয়। এ খবরটিও প্রবাসী শ্রমিকদের দুঃশ্চিন্তার বোঝা বাড়িয়ে দেয়। দেশে ফিরে এসে কোন অথৈ সাগরে পড়বেন সেটা ভেবেই তারা দিশেহারা হয়ে যান। এ ক্ষেত্রে তাদেরকে কার্যকর সহযোগিতা দূরে থাক, একটু বল-ভরসাও কেউ যোগায় না। এমনকি তাদের টাকায় চলা বাংলাদেশি মিশনগুলোও তাদের খোঁজখবর রাখে না।

সরকারের কাছে প্রবাসী শ্রমিকের সংখ্যা নিয়েও স্পষ্ট কোনো তথ্য নেই। বৈধ-অবৈধ নানা পন্থায় দেশ ছেড়ে মানুষ বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন। এক হিসাবে এ সংখ্যাটা প্রায় ৬০ লাখ। দেশের সবচেয়ে বড় আয় তারাই এনে দেন। ২০০৫-০৬ সালে সরকারি হিসাবে প্রবাসীরা পাঠিয়েছেন প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকা। যা ওই সময়ের বিদেশি সাহায্যের তিন গুণ এবং জিডিপি'র ৭.৭৩ শতাংশ। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে এর পরিমাণ ৫০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যায়। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে রেমিটেন্স এসেছে ৭৯২ কোটি ডলার। অর্থাৎ প্রায় ৫৪ হাজার ৭শ' কোটি টাকা। হুন্ডির মাধ্যমে আসা টাকা যোগ করলে অঙ্কটা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাবে।

প্রবাসীদের পাঠানো টাকার সঙ্গে আরো একটি খাতের অবদান তুলনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বলা হয়ে থাকে যে গার্মেন্টস খাত দেশে সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আনে। গার্মেন্টস খাত কত দেয়? ২০০৮ সালে এ খাতে এসেছে ৭শ' কোটি ডলারের কিছু বেশি (৪৮ হাজার ৩শ কোটি টাকা প্রায়)। অর্থাৎ দুটোর খাতের অবদান প্রায় সমান। কিন্তু গার্মেন্টস খাতে আসা টাকা কি সবটা দেশে থাকে? তা কিন্তু থাকে না। এ খাতে আসা টাকার অর্ধেক আবার ওই শিল্পের কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি আমদানি বাবদ বিদেশে ফেরত চলে যায়। তাছাড়া গার্মেন্টস মালিকরা এ অর্থের একটা বড় অংশ বিদেশে জমা করে, বিলাসী দ্রব্য ক্রয়, বিদেশ ভ্রমণ ইত্যাদি খাতে বিদেশে খরচ করে, মোদ্দা কথা বৈধ-অবৈধ নানা পন্থায় বিদেশে পাচার করে। এর চেয়ে বড় কথা হল, গার্মেন্টস খাতে যাদের রক্তে-ঘামে এ অর্থ আসে তারা অর্থাৎ শ্রমিকরা কিন্তু এর ছিঁটেফোঁটাও পায় না। বরং এ অর্থ এনে দেওয়ার কৃতিত্ব দেখিয়ে গার্মেন্টস মালিকরা শত কোটি টাকার ট্যাক্স ছাড় করিয়ে নেয়। গার্মেন্টস শ্রমিকদের ভাগে কিছুই জোটেনি বললে ভুল বলা হবে, তাদের ভাগে পড়েছে ছাঁটাই, কম মজুরি আর মাত্রাহীন শোষণ।

গার্মেন্টসের প্রসঙ্গটা এখানে আনার কারণ হল, প্রবাসী শ্রমিকদের অবস্থার একটা তুলনামূলক চিত্র হাজির করা। গার্মেন্টস মালিকদের জন্য এ যাবতকালে সরকার যত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে দিয়েছে (যার প্রকৃত হকদার তারা নন) তার সিকিভাগও কি প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য করেছে? প্রবাসী শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কি আমাদের দূতাবাসগুলো তৎপর হয়েছে? কাজের খোঁজে হন্যে এই মানুষগুলো যাতে প্রতারণার শিকার না হয়, সর্বস্বহারা না হয় তার জন্য কি দেশে সরকারি সংস্থাগুলো তৎপর? তাদের পাঠানো অর্থ যাতে নিরাপদে দেশে আসতে পারে, আত্মীয়-স্বজনদের হাতে পৌঁছতে পারে তার কি কোনো ব্যবস্থা করা হয়েছে? ইতোমধ্যে সেনাবাহিনী নিজেদের জন্য একটি ব্যাংক গড়ে তুলেছে। সেনাবাহিনী একটি আর্থিক সংস্থা না হয়েও ব্যাংক গড়ে তুলল, আর যে প্রবাসীরা কোটি কোটি টাকা পাঠাচ্ছেন তাদের অর্থের নিরাপত্তা ও বিনিয়োগ নিশ্চিত করার জন্য কেন একটি ব্যাংক স্থাপন করা হল না? বিদেশি ঋণসাহায্যের পেছনে না ছুটে আমরা যদি প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ কাজে লাগাই তাতে প্রবাসীদের অর্থের নিরাপত্তা এবং বিনিয়োগ দুটোই নিশ্চিত হয়। বাসদ-সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং অর্থনীতিবিদদের অনেকেই বার বার এ তাগিদ দিয়েছেন। কিন্তু এ নিয়ে সরকারের কোনো উদ্যোগ বা পরিকল্পনা আছে বলে শোনা যায় নি। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বা আইএলও'র দাবি হচ্ছে রেমিটেন্সের ৫ ভাগ ওই সব প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য খরচ করতে হবে। আইএলও'র সদস্য দেশ হয়েও বাংলাদেশ এমন কোনো উদ্যোগ এখন পর্যন্ত নেয় নি।

একটি বাংলা প্রবচনে বলে, 'তেলা মাথায় ঢাল তেল, শুকনা মাথায় ভাঙ্গ বেল'। কথাটার অর্থ বুঝিয়ে বলা অনাবশ্যক। এ দেশে এ নীতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়। কি দেশের শ্রমিক, কি বিদেশে কর্মরত শ্রমিক – শ্রমজীবী মানুষের ভাগ্যে ওই শুকনা বেল। প্রবাসী শ্রমিকরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন। এ অবস্থার প্রতিকারে তারা সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারবেন এমন রাস্তাও তাদের জন্য খোলা নেই। তাদের যে দু'চারটি সংগঠন আছে সেগুলোও 'তেলা মাথা'-অলাদের দখলে। এ অবস্থা পাল্টানোর দায়িত্ব নিতে হবে দেশের শ্রমজীবী মানুষদেরকে। দেশকে এগিয়ে নিতে হলে দেশপ্রেমিক সকল মানুষকেই এর সাথে সামিল হতে হবে।